International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies,2014,Vol 1,No.3,87-96.
Available online at httt://www.ijims.com
ISSN: 2348 – 0343

Molestation of Women and Behavioural Reflection in People of Present Society in the Novel " Dahan" Authored by Suchitra Bhattacharjee

নারীর শ্লীলতাহানি ও বর্তমান সমাজ মানসে তার প্রতিক্রিয়াঃ প্রেক্ষিত সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন'

Chakraborty Arupa
Department of Bengali , Tripura University,India

Present Civilized society not yet fully accepted the concept of feminism .It is from the age of immemorial,discriminated women used to satisfy by accepting patriarchal norms and their life experiences have been transmitted to the next generation."Suchitra Bhattacharya" is one of those who continued to pen for Women's rights and gender discrimination in the Bengali literature. In her novel "DAHAN" (1998) she describe the incidence of molestation of a housewife in public metro station. No one among the countless people came forward to protect that housewife from scandalous youth. She faced that cruel situation even after having husband with her. Only a stranger girl namely "Srabana" rush to save "Ramita" from that situation. Srabana Shows indomitable courage in front of Police , Police Court - for protest against the establishment. Ultimately, she acquired bitter experience after knowing that Ramita's family became hopeless and wants to make matter confidential.Molestation affected Ramita also living with wounds in heart and extreme disdain .There is no language in protest against it. The physical appearance of women in the context of current society, writer gathers here.
Keywords: molestation,women, society, novel Dahan

নারীবাদ বা লিঙ্গ বৈষম্যের তাত্ত্বিক প্রয়োগ সাম্প্রতিক কালের বিষয় হলেও নারীবাদী পশ্চিমী চিন্তাধারার প্রকাশ অত্যন্ত প্রাচীন। ভার্জিনিয়া উল্ ফের 'আ রুম অব ওআন'স ওন' এবং সিমোন দ্য বেবোয়ার 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' প্রকাশের পর এই চিন্তাধারা নতুন যুগের, নতুন চিন্তার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। পশ্চিমের আবরণ ছাড়িয়ে সাম্প্রতিককালে বাংলা সাহিত্যে নারীবাদী বা লিঙ্গ বৈষম্যের ধারনাটি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হচ্ছে। সাহিত্যে নারী চরিত্র অঙ্কিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে যুগের প্রভাবে ভাবনার অন্তরাল থেকেই নারীদের মধ্যে নিজেদের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের পাশাপাশি বর্তমান সমাজ জীবনেও এই নারীবাদী চিন্তাধারা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যিকদের লেখায় সমসাময়িক নারী জীবনের প্রতিচ্ছবি অনায়াসেই প্রতিফলিত হয়েছে। পুরুষের আগে প্রাকৃতিক নিয়মে মেয়েরা জেনে গিয়েছিল তারা কেন মেয়ে। কোথায় তাদের বৈপরীত্ব। বীর সন্তান প্রসবিনী মেয়েদের সন্তান ধারনের ক্ষমতাকে পুরুষ তার শারীরিক শক্তির চেয়ে বেশি গুরুত্ব

ও মর্যাদা দিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা পুরুষ বুঝে গিয়েছিল মেয়েদের তুলনায় প্রাকৃতিক নিয়মে তাদের স্বাধীনতা বেশী। পুরুষের এই সচেতনতা থেকে লিঙ্গ প্রভুত্বের আত্মপ্রকাশ। তাই খুব বেশিদিন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বহাল থাকেনি। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে প্রকৃতির তৈরি হল অবরোধ প্রথা। এই অবরোধে লিঙ্গ বৈষম্যকে আরো শক্ত হাতে কাজে লাগানো হল। মানুষের তৈরি বৈষম্যকে চিহ্নিত করার সঙ্গে সেগুলিকে সমাজজীবন থেকে বাতিল করার প্রয়াস মানুষই করেছে। সভ্যতার নিত্য নতুন বিকাশের সঙ্গে মানুষ টের পেয়েছে স্ত্রী-পুরুষে আদৌ কোন বৈষম্য নেই।

প্রেমিকের হৃদয় জয় করার আকুলতার সঙ্গে ব্যক্তি হিসাবে নিজের স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রচ্ছন্ন অথচ তীব্র অভিমানের মানসিক পরিচয় মেয়েরা সংরক্ষণ করতে পারে। তাই তারা মেয়ে। স্ত্রী-পুরুষের শরীর নির্মানে বৈচিত্রের চেয়ে দুপক্ষের আচরণ ভিন্নতাকে তারা প্রাধান্য দিয়েছেন। মেয়েরা যেন চিরকালের পণ্য। সমাজ তাদের নয়। তারা সমাজের জন্য। তাই সেই পর্বের কোন যথার্থ ইতিহাস নেই। সাহিত্য আসলে বহমান জীবন ধারারই প্রতিচ্ছবি। তাই সাহিত্যে বাস্তবের সমস্যাও রূপ নেয় নতুন রঙ্গে, অভিনব রূপে। কিন্তু সে নারীবাদী ধারনাকে বর্তমান সভ্য সমাজও মনে প্রানে গ্রহণ করতে পারেনি। স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসা বৈষম্যের স্বীকার নারীরাও পিতৃতান্ত্রিক ধারণাকে ধারণ করেই তৃপ্তি লাভ করেছে এবং নিজ জীবন অভিজ্ঞতাকে সঞ্চারিত করেছে তার পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের নারীর অধিকার ও লিঙ্গ বৈষম্যের প্রতি যারা কলম চালিয়েছেন তাদের অন্যতম হলেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য। তাঁর 'দহন' উপন্যাসের শুরুতে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা চিত্রে নারীর স্বাভাবিক সন্মানহানির চিত্রতা পরিস্ফুট। এটিই উপন্যাসের আগাম বার্তা। তাছাড়া সমাজের নারীঘটিত অপরাধের অন্যতম উদ্দীপক হিসাবে টেলিভিশনের এইসব অশ্লীল ও উত্তেজনাকর চিত্র তুলে ধরে পাঠক সমাজকে সচেতনতার বার্তা দিয়েছেন। কিন্তু এইসব দৃশ্য আধুনিক কিছু মানুষের রুচিকর হলেও সভ্য সমাজ প্রকৃত শিক্ষিতের রুচিতে এ সমস্ত দৃশ্য বাধে। উপন্যাসের নায়িকা ঝিনুকও সেই সভ্য সমাজে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু সকলে আধুনিক সভ্যতার এই নগ্ন রূপটিকে গ্রহণ করেনি। তার প্রমান বিশাখার বাবা। এই সংস্কৃতির প্রতি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয় উঠতি বয়সের তরুণ-তরুনীরা। ঝিনুকের মনে হয় এই টেলিভিশন মানুষের মধ্যে এমনিভাবে ক্রিয়াশীল, দেখলে মনে হয় ম্যাজিক বক্স। মানুষের 'রক্তের কনিকায় অমোঘ বাসনার মতো ঢুকে পড়ে ওই ম্যাজিক বক্স।'[১]

ঝিনুক এ উপন্যাসের নায়িকা। তার আসল নাম শ্রবণা। সে তূণীর নামক একটি ছেলের সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। পূর্বের মতো এখন তূণীর ততটা সময় দিতে পারেনা চাকুরিসূত্রে সে এখন শুধুমাত্র অফিসময় হয়েই থাকতে চায়। 'অথচ চাকরিটা পাওয়ার আগেও তূণীর ছিল অন্যরকম। তখন তার শয়নে স্বপ্নে নিদ্রায় জাগরণে ঝিনুক ঝিনুক।'[২] তূণীর সব কাজেই একটু বেশি সিরিয়াস প্রকৃতির।

‘দহন’ উপন্যাসে লেখিকা যে চরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাদের প্রথম হল শ্রবণা, দ্বিতীয় রমিতা। শ্রবণা স্বাধীন কর্মরতা এবং যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহনে অটল, আর রমিতা গৃহবধূ। মানসিকভাবে আধুনিকতার দ্বারা আকৃষ্ট হলেও সে অনুযায়ী চলাফেরায় তার আপত্তি আছে। আধুনিক পোশাকে আকৃষ্ট হয়েও সকলের মতামতের উপর তাকে নির্ভর করতে হয়। স্বাধীন মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা তার নেই। রমিতা ও পলাশ মোটামুটি সুখী দাম্পত্য জীবনেই অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু নিউ মার্কেটে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ সেদিন শ্লীলতাহানির শিকার হতে হয়। সুন্দরী রমিতার প্রতি পলাশ বরাবরই মুগ্ধ। হানিমুনে গিয়ে পলাশ অবাক দৃষ্টিতে শুধুমাত্র রমিতার সুন্দর মুখটাকেই দেখেছে। সেই সৌন্দর্য আজ ভয়াবহ বিপর্যয় নিয়ে এসেছে রমিতা-পলাশের জীবনে। টালিগঞ্জ মেট্রো ষ্টেশনের পাশাপাশি বৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য আলাপের মাঝেই অশ্লীল থাবায় জর্জরিত হয় রমিতার দেহ। চার-পাঁচজন যুবক মিলে নোংরা হাতে স্পর্শ করছে তার শরীর। সামনে পিছনে বিশ্রিভাবে কুৎসিত চাহনিতে বিদ্ধ করছে। পলাশ বাঁধা দিতে আসলে তাকেও সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অশ্রাব্য গালিগালাজের দ্বারা। রমিতা থুতনি স্পর্শ করে একটি ছেলে বিকৃত সুরে কথা বলতে শুরু করল। তখনই পলাশ রাগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তাদের দিকে এগিয়ে যায়। সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে এহেন অশ্লীল আচরণের কথা জানাতে থাকে কাতরভাবে। কিন্তু জনতা নীরব দৃষ্টিতে তাদের নিরীক্ষণ করতে থাকে। রমিতাকে দুহাতে চেপে ধরে দুটো ছেলে। লেখিকার কথায়- ‘যেন রুদ্ধশ্বাস কোন ফিলমের শুটিং দেখছে সবাই।’[৩] কিন্তু কেউ এগিয়ে এসে তাদের সাহায্য করছে না। পলাশ তাদের অশ্লীলতা থেকে রমিতাকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। রমিতার আর্তনাদ সমবেত জনতার মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করতে পারছে না বলেই তাকে রক্ষা করতে আজ কেউই এগিয়ে আসছে না। ‘রমিতা অসহায়ভাবে ভিড়ের মানুষের সাহায্য চাইল,- আপনারা কিছু করুন। প্লিজ কিছু করুন।’[৪] যদিও বা কিছু লোক এসব থামানোর জন্য কিছুটা উপদেশ দিতে যাচ্ছিলেন ততক্ষণে একটি ছেলের লাথিতে আবার স্তব্দ হয়ে যান সকলে। নিস্তব্দ দর্শকের মতই তাদের কাছে দর্শনীয় এই বিষয়টি। এবারে ‘প্রতিপক্ষহীন মানুষের জঙ্গলে নির্ভীক বীরের দল এবার রমিতাকে নিয়ে উল্লাসে মেতেছে। ঝটকা টানে রমিতার আঁচল লুটিয়ে পড়ল।’[৫] রমিতা তখন চূড়ান্ত অপমানের সঙ্গেই এই বিষয়ে একেবারে নির্বাক। পলাশও আর প্রতিরোধের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কারণ সে একা আর তারা চার-পাঁচজন।

ঝিনুক এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে হঠাৎই কাঁধের ব্যাগ দিয়ে এলোপাথাড়ি ব্যাগ ঘুরিয়ে তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। অনেক চেষ্টা করে সে রক্ষা করে রমিতাকে। সমবেত জনতার চৈতন্য ফিরে আসে ঝিনুকের এহেন কার্যকলাপে। তারাও তাড়িয়ে দেয় এদেরকে। এই ধস্তাধস্তিতে ঝিনুকও আহত হয়। তার হাত দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে। অশান্ত ঝিনুককে মানুষের নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা ভীষণভাবে আঘাত করে। তার কথায় ‘শহর নোংরা হয় না। শহরের মানুষরা নোংরা হয়। এতগুলো নপুংসক এক

জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে......থুঃ থুঃ।'[৬] ঝিনুকের এই ভাবনা লেখিকার সমাজ মানসিকতা সম্পন্ন। শহরের মানুষের প্রতি ঝিনুকের এই কটাক্ষের দ্বারা লেখিকা শহরে বাস করা তথাকথিত প্রগতিশীল মানুষের বিবেকহীনতার কথাই তুলে ধরেছেন। এভাবেই বিশ্বায়নের যুগে প্রতিনিয়ত নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। তাকে রক্ষা করার কোন মানসিকতা প্রত্যক্ষদর্শী মানুষদের মধ্যে তৈরি হয় না। এ উপন্যাসে নারীকে বিপন্ন অবস্থা থেকে রক্ষা করল আর এক নারী। এখানে শুধুমাত্র উত্তেজনাকর একটি মুহুর্তের বর্ণনাই লেখিকার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এখানে নারীর সন্মান রক্ষার দায়িত্ব শুভবোধসম্পন্ন নারীর হাতেই যেন লেখিকা ন্যাস্ত করেছেন।

যথারীতি পরদিন সংবাদপত্রে এই কাজের বিবরণ সহ অজস্র অভিনন্দন এল ঝিনুকের। ঝিনুকের ভাবনায় এই বিষয় আরো গভীর অনুসন্ধানে রত হয়। আজকাল সংবাদপত্রে একটা ফ্যাশন হল নারীনির্যাতন। 'গৃহবধূ হত্যা, গণধর্ষণ, নারীনির্যাতন, শ্লীলতাহানি। তবে সে সব তো শুধু খবরই। সকালে চা খেতে খেতে লোকে এসব কাহিনী গপাগপ গেলে, ট্রেনে বাসে অফিসে বাড়িতে দুদিন আলোচনা করে উত্তেজনার আগুন পোহায়, তারপর স্বাভাবিক নিয়মে ভুলেও যায়।'[৭] এই বিষয়ই আজ ঝিনুকের জীবনে দেখা দিয়েছে। সকলের সহকর্মীরাও তার কাছে ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ নিতে চায়, নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে। সেখানেও ঝিনুককে নানা অপ্রীতিকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। বউটার ড্রেস কীরকম ছিল রে? সভ্য ভব্য, না প্রোভোকেটিং?'[৮] তাদের মধ্য থেকে কিছু পুরুষবিদ্বেষী নারীরা এতে প্রতিবাদ জানিয়ে তাকে বাহবা দেয়। ঝিনুকের পুলিশের উপর অগাধ বিশ্বাস। সে ভাবে পুলিশের ডায়েরি করা হয়েছে বলেই অপরাধীদের শাস্তি হয়ে যাবে। ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানির পর পুলিশকর্মীদের অভব্যতা সম্পর্কে তার সকলেই একমত। মিতা এই ব্যাপারে নিজের মতামত জানাতেও দ্বিধা করে না। 'পুলিশেরা ওইরকম অসভ্য হয়। সব সময়ই ওদের জিভ লকলক করে। পারলে ওরা কথা দিয়েই ধর্ষণ করে নেবে।'[৯] মিতার এই কথা শুধুমাত্র একটি মন্তব্যমাত্র নয়। এভাবেই প্রতি পদে পদে উত্যক্ত হতে নির্যাতিত ধর্ষিত নারীদের। এমনভাবে প্রশ্ন করা হয় যেন ঘটনাটি সত্যতা প্রকাশ করতে পুরো ঘটনার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। এভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত নারীকে আরো ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা বুঝতে পারে না যে ধর্ষিতার কাছে এই বিকৃত স্মৃতি কতটা প্রভাব ফেলতে পারে। ঝিনুককে এই কথাগুলিই বেশি করে বেদনাবিদূর করে তোলে।

ঝিনুকের স্কুলের সহকর্মী মাধুরীর গৃহী সুখী জীবনেও সমস্যা রয়েছে। উপার্জনকারী হয়েও তার বাড়িতে সে নিজের প্রয়োজনমতো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। শাশুড়ির শুচিবাইগ্রস্থতা ও স্বামীর সংসার সম্পর্কে ঔদাসীন্য তার মধ্যেও পরিবর্তন এনে দিয়েছে। প্রকাশ্য কোন প্রতিবাদ মাধবী দেখায়নি। কিন্তু এত পরিশ্রম করেও সে মেলা ও সিনেমা দেখতে উৎসাহ দেখায়। ঝিনুকের মনে হয় 'হয়তো এটাই

মাধুরীর সুপ্ত বিদ্রোহ। দম বন্ধ করা খাটুনির বিরুদ্ধে। অবিচারের বিরুদ্ধে।'[১০] ঝিনুকের জীবনে তার ঠাকুরমার মৃণালিনীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্রে ঝিনুকের এই ঘটনার খবর পেয়েই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। ঝিনুকের মায়ের এই বিষয়ে কিছুটা গর্ব হয়। কিন্তু তার পিতার কাছে এটাই অন্যতম দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে যায়। সেদিনের ঘটনার পর ঝিনুক থানায় ডায়েরি করতে গিয়েছিল। বেশিক্ষণ পর্যন্ত ঘরে না ফেরার জন্য তার বাবার চিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু ঠাকুরমা মৃণাল ঝিনুককে বরাবরই উৎসাহ দেন। তিনি শুধুমাত্র ঝিনুককে নিয়েই তার ভাবনার কথা জানালেন না। দূর্ঘটনার শিকার মেয়েটির অর্থাৎ রমিতার খবর নেওয়ার জন্যও ঝিনুককে বলে দিলেন। কারণ তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন নির্মম ঘটনার শিকার মেয়েটির অন্তরবেদনাকে। 'লজ্জা ঘেন্নায় মেয়েটার কী অবস্থা কে জানে!'[১১] ঝিনুক ফোনে রমিতার খবর নিতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কারণ তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন এ ঘটনাটা নিয়ে আর কোন বাড়াবাড়ি পছন্দ করছে না। রমিতার ঝিনুকের সঙ্গে মেলামেশাটাও তাদের কাছে বিরক্তিকর। লেখিকা রমিতার পরিস্থিতি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ভাবে তুলে ধরেছেন। 'আজকাল যে কোন সামান্য শব্দেও এরকম চমকে উঠে রমিতা, কনকনে এক শীতল অনুভূতি তার মেরুদণ্ড কাঁপিয়ে দেয়, দাঁতে দাঁত লাগতে চায়। বোঝায় ধরে রমিতাকে। হঠাৎ কখনও কখনও রাত্রে ঘুম ছিঁড়ে গেলে নিজের বুকের লাবদুবে নিজেই কাঠ রমিতা। মুখ থেকে কণ্ঠা, কণ্ঠা থেকে বুক পেট কোমর পা বেয়ে তখন ওঠানামা করতে থাকে শতসহস্র অদৃশ্য মাকড়শা।'[১২] একটি মাত্র ঘটনা রমিতার সুখ উজ্জ্বল সংসারে আনে ঘোর তন্দ্রাচ্ছন্নতা। এখন রমিতা সব কিছুতেই স্তব্দ। রাতে তার ঘুম আসে না। পাশে থাকা সবচেয়ে প্রিয়জন স্বামীকে ডাকতেও তার সাহস হয় না। 'ডাক্তারের দেওয়া কড়া ঘুমের ওষুধেও না। সারা রাত তখন শুধু নিস্পন্দ জেগে থাকা।'[১৩] বাড়ির সকলের কাছেই তার মূল্য যেন কমে গেছে। বিশেষ করে স্বামী পলাশ সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে রমিতাকে ছেড়ে না দিয়েও একটা নিবিড় শূন্যতা ও আড়ালতার মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করতে চাইছে। তার সুখী দাম্পত্য জীবনে এল নিদারুণ বিড়ম্বনা। এত জ্বালা যন্ত্রণা তার কাছে অসহ্য মনে হয়। তাছাড়া 'রমিতার নিজের জ্বালা যন্ত্রনার কথা তার মাথাতেই ঢোকে না।'[১৪] ছেলেগুলোকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে এবং রমিতাকে সনাক্ত করতে থানায় যেতে হবে। এ খবরটা পলাশ রমিতাকে জানায়নি। এ বিষয়ে রমিতার মনে অভিমান জাগে। কিন্তু ঘটনার পরবর্তী নিজের পরিস্থিতি ভেবে সে শান্ত হয়ে পড়ে। ঘটনার দিন অর্থাৎ 'সে রাতে এমন বিশ্রী কান্নাকাটি করেছিল সে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না থেকে হঠাৎ হঠাৎ আর্তনাদ। গোঙানি। ঘুমের ঘোরেও নাকি সারাক্ষণ বিড়বিড় করে গেছে, অ্যাই ছুঁয়ো না আমাকে। ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও বলছি। প্রথম দু-তিনটে রাত সে তো পলাশের স্পর্শও সহ্য করতে পারেনি।'[১৫] লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য এখানে রমিতার জীবনে প্রত্যক্ষ বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ষিতা বা শ্লীলতা হানির শিকার নারীর মানসিক ও শারীরিক বিপর্যতার ছবি অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ

করেছেন। এভাবেই একটি নারীর জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। সবকিছুই তখন তার কাছে ভয়ের বস্তুতে পরিণত হয়। যা হয়েছে রমিতার ক্ষেত্রে। স্বামীর সুখস্পর্শও তার ভীতিকে জাগিয়ে তোলে।

এই বিশ্রী বিসদৃশ দৃশ্যগুলো এখন যথাসম্ভব ভুলতে চেষ্টা করে রমিতা। জীবনের সুন্দর সুখকর দৃশ্যগুলিকে জোড় করে মনে করতে চায়। কিন্তু পরক্ষণেই ‘সব সব দৃশ্য ছিন্ন ভিন্ন করে ছেলে চারটের মুখই কেন যে দুলে দুলে উঠে! তাড়া করে রমিতাকে।’[১৬] এভাবেই রমিতাকে বার বার সুন্দর শরীরকে নিয়ে পুরুষের লোভনীয় হয়ে ওঠতে হয়েছে। ‘অসংখ্য পুরুষ মহার্ঘ আপেল ভেবে বহুবার তাকে চোখ দিয়ে লেহন করেছে।’[১৭] কিন্তু এই ঘটনাটা এর থেকে অনেক বেশি নির্মম। লোভের সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে পাশবিকতা এবং অভব্য পুরুষের অশ্লীল আচরণ। এই ঘটনায় হয়তো রমিতার শারীরিক ক্ষতি কিছুই হয়নি। কিন্তু মনের ক্ষতি হয়েছে অনেক। ক্ষতি না হলেও অনেক ক্ষেত্রে তার মনে প্রশ্ন জেগেছে। ‘তবে কেন মা খালি বলছেন মেয়ে মানুষের গায়ে একটা দাগ পড়লেই মৃত্যু পর্যন্ত সে খুঁতো হয়ে যায়!’[১৮] এভাবেই রমিতার ভাবনার অন্তরালে বিষ জমতে থাকে। তার আপন অর্থাৎ অত্যন্ত কাছের লোকের আচরণই তার কাছে বিসদৃশ মনে হয়। কারণ এই লোকগুলোই তাকে নানাভাবে ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে খাটো করবার চেষ্টা করেছে। এদের উদ্দেশ্য হয়তো ভাল। তারা রমিতার জীবন থেকে এই ঘটনাটির স্মৃতি ধুয়ে মুছে দিতে চাইছে। পাশাপাশি নিজেদের সন্মান রক্ষার্থে রমিতাকে আড়ালে রেখে ঝামেলার মধ্যে যেতে চাইছে না। কারণ সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে হয়তো সকলের কাছে ঘটনাটি অত্যন্ত বিশ্রীভাবে উপস্থিত হবে। রমিতাকে নিয়ে সকলের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ঝিনুকের প্রতিবাদ তাই রমিতার শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের কাছে অসহ্য মনে হয়। এই বিষয়ে তাদের যুক্তি- ‘আমরা চাই না বাড়ির বউ এই নোংরা ঘটনায় ফার্দার জড়িয়ে পড়ুক।’[১৯] একদিকে পলাশের যুক্তি সঠিক। কিন্তু অন্যভাবে এই যুক্তির কোন অর্থই নেই। যে ঝিনুক কিনা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রমিতাকে বাঁচাল তার কাছে মানবিকভাবে কৃতজ্ঞ থাকা পলাশের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কৃতজ্ঞতা ভুলে গিয়ে পলাশ এখন নিজের বাড়ির মর্যাদা রক্ষার চেষ্টায় রত। যাবতীয় তথ্য প্রমাণ বিলুপ্ত করে ঘটনাটি নির্বিঘ্নে সারিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। রমিতার জোর করে কথা বলার সাহস নেই। পলাশের যুক্তিসম্মত কথা গুলিই রমিতাকে আজকে বেশি করে আঘাত করে। পলাশকেও সেদিনের ঘটনার জন্য জবাবদিহি করতে হয়। লোকের কাছে, অফিসের বসের কাছে ও সহকর্মীদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছে। ঘটনাটা মলেস্টেশান না রেপ ছিল? রেপ লুকিয়ে পলাশ মলেস্টেশান লিখিয়েছে কিনা এ ধরনের প্রশ্নের সন্মুখীন হতে হয়েছে। এইগুলি পলাশের আত্মসন্মানে লাগে। ব্যাপারগুলি পলাশের কাছে বিরক্তিকর হলেও সে কোন প্রতিবাদ করতে পারে না। আর সেখানেই রমিতার আঘাতটা আরো প্রবল আকার ধারণ করে। বিয়ের আগে ছেলেগুলির সঙ্গে রমিতার পরিচয় ছিল কিনা এ বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করে পলাশ।

পলাশ কিছুটা পরিবারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার মা তাদের সেদিন থানায় গিয়ে রিপোর্ট লেখানোটা পছন্দ হয়নি। তিনি ভাবছেন, বাড়ির গৃহবধূ যাকে সমস্ত রকম সুবিধা দেওয়া হয়েছে, সেই রমিতাই বাড়ির সন্মানের কথা না ভেবে থানায় রিপোর্ট লিখিয়েছে। এতে করে সংবাদ মাধ্যম যেমন দর্শক ও পাঠকদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করবে পাশাপাশি মহিলা কমিশনও একে নিয়ে ঘাটাঘাটি করবে। তাছাড়া রমিতার ছেঁড়া ব্লাউজটা থানায় ডিপোজিট করে আসার জন্য তার শ্বশুরের রাগ হয়। প্রত্যেকটি মানুষই নিজের আত্মসন্মান ও বংশমর্যাদা রক্ষা করতে লেগে গেছে। রমিতার মানসিক অবস্থা চিন্তা করার কারোর কাছে সময় নেই। উল্টো তার উপর দোষ চাপিয়ে তার আত্মাঘাতকে প্রবল করে তুলেছে। এখানেই একজন নারীর আত্মাবমাননার শিকার হচ্ছে তারই প্রিয়জনদের হাতে। এটা মনুষ্যত্বহীনটার চূড়ান্ত রূপ। লেখিকা অত্যন্ত নিপুণ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমাজের তথাকথিত ভদ্রসমাজের চালচিত্রকে এ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র পরিবারের মানুষদের উপর দোষ চাপিয়ে লাভ নেই। আমাদের সমাজের নিয়মনীতিতেই বিভিন্ন ত্রুটি রয়েছে। ধর্ষিতার ছেঁড়া কাপড় নিয়ে আদালতে নর্দমা ঘাঁটানোর মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তখন ভদ্র ভব্য কোন পরিবার আর তাদের এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে আদালতে আসতে চায় না। শত অন্যায় সহ্য করেও তারা নীরবে নিভৃতে সে অন্যায় মেনে নেয়। রমিতার ছেঁড়া ব্লাউসও হয়তো এক্ষেত্রে অবমাননার প্রথম ধাপ হয়ে উঠতে পারে। 'এবার উকিলরা ওই ব্লাউজ নাড়াবে। বুঝেছ? এগ্‌ জিবিট নাম্বার ওয়ান.'[২০]

রমিতার শ্লীলতাহানির সঙ্গে যুক্ত গুণ্ডাদের সনাক্ত করার জন্য ডাক আসে পলাশের। কিন্তু দেখা যায়, পাঁচ জনের মধ্যে চারজনই ভদ্র ও ভব্য বাড়ির। তাদের সনাক্ত করতে গিয়ে পলাশও দ্বিধায় পড়ে। 'তাদের সামনে গিয়ে আইডেন্টিফাই করা...... পিওর বস্তি ক্লাসের গুণ্ডা বদমাশ হলে তাও কুকুর বেড়াল ভেবে উপেক্ষা করা যায়... এ যেন নিজেরাই নিজেদের চেনাচ্ছি।'[২১] তাছাড়া পলাশ নিজেও কিছুটা হীনমন্যতায় ভুগছিল কারণ সে একা রমিতাকে রক্ষা করতে পারেনি। এটা তার পৌরুষের পক্ষে অবমাননাকর। কিন্তু আসল সত্য হল তখন একা পলাশের পক্ষে তখন এতগুলো মানুষের সঙ্গে পেরে উঠা সম্ভব ছিল না। ঝিনুক তার স্ত্রীকে রক্ষা করেছে। সেই বিষয়টা সাময়িক তৃপ্তি দিলেও তার পৌরুষ সুলভ মানসিকতা এর বিরোধী হয়ে উঠে। রমিতাকে যেকোন বিষয়ে তাচ্ছিল্য করতে এখন পলাশ আর ভয় পায় না। তাদের সম্পর্কের মধ্যে বরাবরই চলে আসে ছেলেগুলোর করুণ স্পর্শের কাহিনির ব্যঙ্গাত্মক রূপটি। পলাশই বার বার রমিতাকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করে ঐ ঘৃন্যতম ঘটনাটির কথা। 'কী ভাল লাগছে? ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে পালিয়ে যাবার কথা ভাবতে?'[২২] রমিতা এবারে সত্যি সত্যিই পলাশের মনের বিষ জর্জরিত চেহারাটা দেখতে পায়। এভাবেই নারীকে অপদস্ত করে চলে পুরুষ। সেগুলোকে মেনে, সংসার জীবনে নিদারুণ মানসিক বিধ্বস্ততা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় নারীকে। এর বিরুদ্ধে স্পষ্ট কোন প্রতিবাদ করার ভাষা তার নেই। নীরবে নিভৃতে চলে তার চাপা আর্তনাদের সুর।

তারপরই লেখিকা ঝিনুকের সংগ্রামের কাহিনি বলেছেন। ঝিনুক আদালত পর্যন্ত গিয়ে রমিতার প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার চেয়েছে। কিন্তু এই কাজে তার সমর্থনকারী কেউ নেই। এমনকি যার জন্য সে এতটা এগিয়েছে সেই রমিতাও তার পাশে আসতে পারছে না। আদালতে গিয়েও ঝিনুককে নানাভাবে লজ্জিত হতে হয়েছে। তবু সে দমে যাবার পাত্রী নয়। লেখিকা এখানে আমাদের প্রত্যক্ষ বাস্তবেরই সম্মুখীন করেছেন। নারী ধর্ষনের বা শ্লীলতাহানির বিষয়গুলো আদালতে আরও কুরুচিকরভাবে উপস্থাপিত হয়। তখন সাধারণ ভদ্র মানুষ এসব নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে ভয় পেয়ে যান। অপরাধীদের জামিন না হওয়ার জন্য ঝিনুক খুশি হয়। কারণ 'যাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বেশি, সামাজিক দ্বায়িত্ববোধও তাদের বেশি থাকা উচিত। যে অপরাধে এদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেটা শুধু একজন মহিলার অপমান পায়, সেটা সমাজের অপমান। সভ্যতার অপমান।'[২৩] একজন নারী হিসাবে লেখিকার নিজের আত্মগত উচ্চকিত হাহাকারই এখানে ধ্বনিত। যারা জীবনের প্রতি পদে পদে নারীর মর্যাদা রক্ষায় কলম চালিয়েছেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য সেরকমই একজন লেখিকা। যিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন নারীর অবমাননা এবং সন্মানহানিকে, বাস্তব ঘটনা নির্ভর না হলেও এ উপন্যাসে লেখিকা একটি অতি বাস্তব বা নিষ্ঠুর বাস্তবকেই আমাদের সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

পুলিশের ভূমিকা নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে কতটা নিষ্ক্রিয় ও ম্রিয়মাণ হয়ে যায় তার কথাও উপন্যাসে উঠে এসেছে। তাছাড়া মধ্যবিত্ত মানুষের সামাজিক অবস্থানও লেখিকা 'দহন' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন শরৎ বাবুর আলোচনার মাধ্যমে। এখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চিন্তা ভাবনা ফুটে উঠেছে। তূণীরের ভাবনায়ও এসেছে পুরুষালি ভাব। পারিপার্শ্বিকের কাছে নীরব আত্মসমর্পনকে মানতে পারছে না। বাবা-মায়ের প্রশ্ন তার অন্তরের আঘাতটাকে আরো তীব্র করে তোলে। অপমানের রাতটা বার বার দুঃখের কালো ছায়া নিয়ে রমিতার জীবনে ঘুরে ফিরে আসে। তাদের দাম্পত্য জীবন চলে মানসিক নয় শারীরিক সম্পর্কে। রমিতার মাসিশাশুড়ির কথা বার্তায় সমাজে চলে আসা পিতৃতান্ত্রিক ধারণার সুরটিই ধ্বনিত। তিনি সরাসরি রমিতাকে দায়ী করেন।

ঝিনুক বার বারই সকলকে বোঝাতে চায় যে এটা এখন শুধুমাত্র রমিতার নয়, সকল নারীর মৌলিক প্রশ্ন। 'একজন নারীর এই সামাজিক পরিবেশে প্রতিবাদ করার অধিকার আছে কি নেই, সেটা জানার প্রশ্ন।'[২৪] ঝিনুক অনেক স্বাধীনচেতা প্রকৃতির। অথচ তূণীর, পলাশ সকলেই এখানে পুরুষতন্ত্রের বাহক। তাই তূণীরকে বিয়ে করতে গেলেও তাকে অলিখিত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে। 'ব্যক্তিগত সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে প্রতিটি পুরুষই হয়ে যাবে দুঃশাসন বা রামচন্দ্র! কেউ প্রকাশ্যে নারীকে বিবস্ত্র করতে চাইবে! অথবা প্রেমিকের ছদ্মবেশে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলবে প্রিয়তমা নারীকে। যেন নারী শুধু তার অধিকারের সামগ্রী! প্রিয়তমা থাকতে হলে নারীকে অর্পণ করতে হবে নমনীয় দাস্য! তবেই অটুট

থাকবে নারী-পুরুষের প্রেমের বন্ধন! প্রেমও এত নিষ্ঠুর।’[২৫] মনে মনে এসব চিন্তা করে ঝিনুক দুঃখ পায়। একসময় স্থির সিদ্ধান্ত নেয়, তূণীরকে বিয়ে না করার। তার এই প্রতিবাদ সমস্ত আঘাত প্রাপ্ত নারীর অন্তরাত্মার হাহাকার। ঠাকুরমা মৃণালিনী তাকে সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থানটি বুঝিয়ে দেয়। ‘দুর বোকা মেয়ে, আমাদের তো সবটাই কয়েদখানা। শুধু জেলার-টা বদল হয়ে যায়। কখনও বাবা। কখনও বর। কখনও ছেলে। কখনও পাঁচিল ঘেরা বাড়ি। সংসার কয়েদে শেকলের গায়ে স্নেহ প্রেম ভালবাসার একটা মোড়ক থাকে। মোড়কটা খসে পড়লে এই গারদখানার থেকে ওই গারদখানা আরও ভয়ঙ্কর।’[২৬] মৃণাল পরাধীন নারীর শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনকে উপলব্ধি করেছে। তার কথায় আধুনিক নারীবাদী চিন্তাচেতনার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। এ উপন্যাসে দহন শুধুমাত্র রমিতার নয়, ঝিনুকের অন্তরদহনও লেখিকার হাতে সমস্ত নারী আত্মার দহন হয়ে উঠেছে।

উৎসনির্দেশ

১। সুচিত্রা ভট্টাচার্য- দহন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ৮
২। প্রাগুক্ত- ৯
৩। প্রাগুক্ত- ২৭
৪। প্রাগুক্ত- ২৭
৫। প্রাগুক্ত- ২৭-২৮
৬। প্রাগুক্ত- ২৯
৭। প্রাগুক্ত- ৩১
৮। প্রাগুক্ত- ৩২
৯। প্রাগুক্ত- ৩৪
১০। প্রাগুক্ত- ৩৭
১১। প্রাগুক্ত- ৪৫
১২। প্রাগুক্ত- ৪৬
১৩। প্রাগুক্ত- ৪৬
১৪। প্রাগুক্ত- ৪৬
১৫। প্রাগুক্ত- ৪৭
১৬। প্রাগুক্ত- ৪৮
১৭। প্রাগুক্ত- ৪৮
১৮। প্রাগুক্ত- ৪৯
১৯। প্রাগুক্ত- ৫১
২০। প্রাগুক্ত- ৫৫
২১। প্রাগুক্ত- ৫৬
২২। প্রাগুক্ত- ৫৭
২৩। প্রাগুক্ত- ৫৯
২৪। প্রাগুক্ত- ১৪৮
২৫। প্রাগুক্ত- ১৫১

২৬।প্রাগুক্ত- ১৬২

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :
১। শেফালী মৈত্র- নৈতিকতা ও নারীবাদ, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণঃ জুন ২০০৭
২। সুধীর চক্রবর্তী (সম্পাদক)- মেয়েদের কথাকল্প, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১০
৩। সুতপা ভট্টাচার্য- মেয়েলি পাঠ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০
৪।সুতপা ভট্টাচার্য- মেয়েলি আলাপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১২
৫। কনক মুখোপাধ্যায়- বাংলা কাব্যে নারীত্বের রূপায়ণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯
৬। তপোধীর ভট্টাচার্য- নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭